অনেক তৃণমূল সমর্থকের ক্ষোভ, অসন্তোষের কথাই বলেছেন জহর সরকার

অমল সরকার

রাত ন'টা-সাড়ে ন'টা হবে। মাছের বাজারে ভিড় কমে এসেছে। শেষ বাজারে এক মাছ বিক্রেতা ভদ্রলোক লটে (লইট্যা) মাছ বেচছেন দুশো কেজি দরে। আর প্রমাণ সাইজের তাজা চিংড়ি সাড়ে তিনশো টাকা কেজি। বললাম, লটে আর চিংড়ির দামে ফারাক মাত্র দেড়শো টাকা! লটে তো ক'দিন আগেও আশি-একশো টাকা ছিল।

পাশের ক্রেতা আলোচনায় যোগ দিয়ে বললেন, শুনুন, ইডি যে টাকাগুলো উদ্ধার করেছে, এরকম কত পঞ্চাশ কোটি কত জনের কাছে আছে কে জানে! এই যে অনুব্রত মেয়ের নামে এত জমি কিনেছে, তাতেও তো কয়েকশো কোটি টাকা আটকে আছে। এই টাকা যদি বাজারে লেনদেন হত, হাতবদল হত, তাহলে আমি আপনি লটে আশি-একশোতেই পেতাম।

মাছ বিক্রেতা ভদ্রলোকও ঘাড় নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিলেন। এর পর পাশের ভদ্রলোক গলা নামিয়ে গোপন তথ্য ফাঁস করার মতো বললেন, "আমার কাছের লোকজন জানে, মত বদলে গতবার জোড়াফুলেই ভোট দিয়েছি। এখন ওরা আমাকে নানা কথা শোনাচ্ছে। বলছে, ওদের ভোট দেওয়ার পরিণাম বুঝতে পারছিস তো?"

দিন কয়েক আগের এই অভিজ্ঞতার কথা বন্ধু-সহকর্মী, অনেককেই বলেছি। সোমবার রাতে টেলিভিশনে জহর সরকারের (Jahar Sarkar) সাক্ষাৎকার দেখার পর বাজারের সেই কথোপকথন আবার মনে পড়ল। যার মধ্যে একটি সত্য লুকিয়ে আছে। তা হল, শিক্ষক নিয়োগ মামলায় (SSC Scam) মন্ত্রী গ্রেফতার, তাঁর ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে

বিপুল ধন-সম্পত্তি উদ্ধার, গরু পাচারকাণ্ডে (Cow Smuggling) দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতার হাজতবাস ইত্যাদি ঘিরে বাংলার শাসক দলকে নিয়ে মানুষের ক্ষোভ এত চরমে পৌঁছেছে যে, লটের দাম দুশো টাকায় পৌঁছে যাওয়ার পিছনেও এই সব অর্থ-লালস ক্ষমতাবানদের হাত দেখছে মানুষ।

ট্রেনে বাসেও আজকাল পার্থ-অনুব্রতদের নিয়ে খুল্লামখুল্লা হাসিঠাট্টা-মজা-মস্করা শুরু হয়েছে। লোকাল ট্রেনের কামরা হল মানুষের মন বোঝার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। যে কারণে বলি, হাওড়া, শিয়ালদহ শাখায় ট্রেনের নিত্যযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য যাদের হয়নি, তারা অর্ধেক জীবন কাটিয়েছে। আমার উপলব্ধি বলে, ট্রেনের কামরায় মানুষের এই প্রতিক্রিয়া মন বদলের প্রাথমিক পূর্বাভাস, যা হেলাফেলা করার নয়। পরিবারে, পাড়ায় বোবা-কালা সেজে থাকা বহু মানুষকেও দেখেছি, ট্রেনের কামরায় কথায় কথায় চার-ছয় মারতে। সেই মানুষরা পার্থ, অনুব্রতদের এখন হাতের কাছে পেলে হামলে পড়বে।

তবে ট্রেনের কামরায়, এখানে ওখানে আড্ডায় মানুষ একটা সময় পর্যন্ত মেপে কথা বলে, পরিস্থিতি বদলের অপেক্ষায় থাকে। ইদানীং নির্ভয়ে শাসক দল সম্পর্কে যা নয় তাই বলার অর্থ স্পষ্ট, ক্ষমতাসীনদের উপর আস্থা, ভরসা, ভয়-ভীতি অনেক কমে গেছে।

জহর সরকারের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে মাছের বাজার, ট্রেনের কামরার প্রসঙ্গ টেনে আনার কারণ, তৃণমূলের এই সাংসদ বহু মানুষের ক্ষোভের কথা বলেছেন। তিনি প্রথমসারির আমলা ছিলেন। বরাবরই পরিচিত মুখ। ফলে তাঁর বিড়ম্বনা বেশি হওয়া স্বাভাবিক। জহর নিজেই বলেছেন, দলীয় রাজনীতির সঙ্গে তাঁর তেমন সম্পর্ক নেই। তৃণমূলের হয়ে রাজ্যসভায় গিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদীর বিজেপির প্রাণ খুলে বিরোধিতা করবেন বলে।

গা শিরশির করছে, পচা অংশ বাদ দিতে হবে: বিস্ফোরক তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার

সাংবাদিকতার সূত্রে জহর সরকারকে বহু বছর চিনি। তিনি ঠোঁটকাটা, স্পষ্টবাদী স্বভাবের মানুষ। অন্যদিকে, অকারণে নিজেকে বরাবর ‘ওয়ান অ্যামং ইক্যুয়াল’ অর্থাৎ সমগোত্রিয়দের মধ্যে সর্বোত্তম মনে করেন, যা কম-বেশি এলিট সোসাইটির মানুষজনের মধ্যে দেখা যায়। অতিমাত্রায় স্পষ্টবাদীতার কারণেই বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে তাঁর

বনিবনা হয়নি, ফলে কর্মজীবনের শেষ কয়েক বছর দিল্লিবাসী হয়েছিলেন। সেখানেও কংগ্রেস, বিজেপি, দুই জমানার দাপুটে মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর খোঁটাখুঁটি লেগে থাকত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণার দিনে দ্য ওয়াল-এ জহর সরকারকে নিয়ে প্রকাশিত লেখায় আভাস ছিল যে এই প্রাক্তন দাপুটে আমলাকে নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে কেমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক তৃণমূল নেত্রী কংগ্রেসে থাকার সময় থেকে।

এটা গেল জহর সরকারের একটি দিক। তাঁর তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার কারণ হিসাবে যে কথা তিনি বলেছেন, সংসদে পা রাখার আগে-পরে একাধিকবার সে কথা তাঁর মুখে শুনেছি। তা হল, সাংসদ হওয়ার সুযোগ নিয়ে তিনি আরও জোরালোভাবে হিন্দুত্ববাদীদের বিরোধিতা করবেন।

জহর সরকারের এই বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। তিনি বছর কুড়ি তো বটেই, হয়তো তারও আগে থেকে নিজের মতো করে দেশের শিল্প-সংস্কৃতি-দেব-দেবী-ধর্মাচরণ-উপাসনা ইত্যাদির সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক নিয়ে পড়াশুনো করছেন। তাঁর লেখালেখির অভিমুখ হল কীভাবে গেরুয়া বাহিনী হিন্দুত্বের নামে এসব নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। সত্যটা উল্টে দিতে চাইছে।

সেই অবস্থান থেকেই তিনি গত বছর বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে একটি বাংলা দৈনিকে লেখেন, এবারের বিধানসভা ভোট বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। লেখাটির বিষয় ছিল, বিজেপি ক্ষমতায় এলে কীভাবে বাংলার ভাষা-সংস্কৃতি-খাদ্যাভাসের গোড়া উপরে ফেলার চেষ্টা করবে। সেই লেখা হোয়াটসঅ্যাপে ভাইরাল হয়। কারণ, বিজেপি-সহ গেরুয়া বাহিনীর বিপদের দিকটি মাঠে-ময়দানে গলাবাজি করা নেতা-নেত্রীদের থেকে অনেক সহজ ও গভীরভাবে বোঝানো হয়েছিল তাতে।

সেই লেখা প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন আগে একটি আলোচনাচক্রে জহরবাবুর সঙ্গে সঞ্চালক হিসাবে আমার উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চট্টোপাধ্যায়ও। বিমলবাবু তখন গুরুতর অসুস্থ। শয্যাশায়ী। সেই অবস্থার মধ্যেই হাফাতে হাফাতে বললেন, বিজেপি শুধু বাংলায় সরকার গড়তে আসছে না। ওরা আমাদের শিক্ষা দিতে আসছে। ওরা মনে করে আমরা বাঙালিরা যথার্থ ভারতীয় নই। ওরা আমাদের খাবারদাবার,

পোশাকআশাক-শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য সব বদলে দেবে।

বিমল চট্টোপাধ্যায় হলেন সেই মানুষ, বর্তমান রাজ্য সরকারের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় যিনি মাঝপথে অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদ ছেড়ে দেন। বিরোধের একাধিক বিষয়ের মধ্যে ছিল শিক্ষক নিয়োগের মামলা। সেই তিনিই বিধানসভা ভোটের আগে খোলাখুলি বিজেপিকে আটকানোর ডাক দিয়েছিলেন। ‘নো-ভোট-টু-বিজেপি’ ক্যাম্পেনে জহর সরকার, বিমল চট্টোপাধ্যায়দের মতো মানুষের বক্তব্য অনুঘটকের কাজ করে।

এই ক্যাম্পেনে অংশগ্রহণকারীদের তৃণমূলের দালাল বলে সিপিএম ও কংগ্রেস আক্রমণ করে তখন। ‘নো ভোট টু বিজেপি’ প্রচারে দীপঙ্কর ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে সিপিআইএমএল-লিবারেশন যেমন ছিল, তেমনই ছিলেন মানবাধিকার সংগঠক এপিডিআরের সুজাত ভদ্ররা। ছিলেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ, যাঁরা দিদির দলের দাদাগিরি, সারদা, নারদ কেলেঙ্কারি, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের ঘটনায় বিকল্পের সন্ধান করছিলেন। কিন্তু ভোটের ময়দানে তখন তৃণমূলের বিকল্প একমাত্র বিজেপি বলেই তারা থমকে দাঁড়ান। কারণ, নির্বাচন হল, মন্দের ভাল বেছে নেওয়ার ব্যবস্থা। তারা তখন মনে করেছেন, বিজেপির থেকে তৃণমূল ভাল। দুর্নীতির থেকে শত গুণ বিপজ্জনক হল সাম্প্রদায়িকতা।

বিধানসভার সেই নির্বাচনের ফলাফল থেকে স্পষ্ট, তৃণমূলের জয়ে কীভাবে ‘নো ভোট টু বিজেপি’ প্রচার পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। বিজেপি এবার ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে। তারা ৭৭টি আসন পেলেও বিরাট জয় হাসিল করেছে প্রাপ্ত ভোটের অঙ্কে। শাসক দলের সঙ্গে তাদের প্রাপ্ত ভোটের ফারাক ৯ শতাংশের মতো। সেখানে আসনের ক্ষেত্রে ফারাক ৪৬ শতাংশের। তৃণমূল পেয়েছে ২১৩ আসন।

বিধানসভা ভোটের আগের দিনগুলি অনেকেরই হয়তো মনে থাকবে যে, শুধু বিজেপির প্রচার নয়, নানা কারণে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রী-কর্মী-সমর্থকের মধ্যেও সংশয় ছিল তারা আর ফিরবে কি না। অনেকের ধারনা ছিল, ক্ষমতায় টিকে গেলেও একশো ষাট-সত্তরে গিয়ে আটকে যাবে দিদির দল।

সব ধারনা উল্টে দিয়ে ২১৩ আসন প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে সেই মানুষের ভোটে যারা

তৃণমূলের সমর্থক নয়, কিন্তু বিজেপিকে আটকাতে তুল্যমূল্য বিচারে জোড়াফুলকে মন্দের ভাল বলে বেছে নিয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জহর সরকারকে তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য করার সিদ্ধান্তে অনুচ্চারিত বার্তাটি ছিল এটাই, তিনি শাসক দলের সেই ভোটারদের প্রতিনিধি যারা তৃণমূলের সমর্থক নয়, কিন্তু বিজেপিকে আটকানোর প্রশ্নে পদ্মফুলের পরিবর্তে ঘাসফুলকে সমর্থন করেছিলেন। বিজেপিকে আটকানোর মুরোদ নেই বলেই বাম ও কংগ্রেসকে ভোট দেননি ওই দুই শিবিরের বহু পুরনো সমর্থকও।

জহর সরকার দলীয় রাজনীতির মানুষ নন। তাঁর প্রতিক্রিয়া নির্ভেজাল। তাতে তৃণমূলের ক্ষতি, অস্বস্তি যা হল, তা সাময়িক বলে মনে করি। বরং দীর্ঘমেয়াদে দলের জন্য ভাল হল। তিনি হয়তো অজান্তেই বিজেপির বিরোধিতায় তৃণমূলকে মন্দের ভাল বলে বেছে নেওয়া সেই মানুষগুলির ক্ষোভ, অসন্তোষ, অভিমানের কথা বলেছেন। তাই তাঁকে সতর্ক করার নামে অসম্মান, অবজ্ঞা করা হবে কালিদাসের মতো পদক্ষেপ। এই লেখা শেষ করার সময়ে একটা বিষয় নজর কাড়ল। আজই তৃণমূলের মুখপত্র ‘জাগোবাংলা’য় জহর সরকারের নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সেই লেখা পড়লেও বোঝা যাবে জহর সরকারদের কেন আস্থার সম্পর্ক বাড়ানো উচিত তৃণমূলের।

[চেপে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, তৃণমূলে কার উপর ক্ষোভ সাংসদ জহর সরকারের!]